শক্তির গদ্য : কুয়োতলা

শিবনারায়ণ রায়

Was ich besitze, sehich Wie im Weiten,
Und was verschwand. Wird mirzu Wirklichkeiten

—Faust

(যা এখন আমার আছে তা মনে হয় অনেক দূরে,
যা মিলিয়ে গেছে তাই এখন মনে হয় বাস্তব।)

শক্তির সঙ্গে পরিচয় হয় পঞ্চাশের দশকে, ষাটের দশকে ও কবিতা পড়ে আকৃষ্ট হই। এতটাই আকৃষ্ট হই যে সত্তরের দশকে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকালে নানা কাজের চাপের মধ্যেও ওর কিছু কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে ওকে পাঠাই এবং ওর সম্মতি নিয়ে একটি অনুবাদ সংকলনের (I have seen bengal's face, 1973) অন্তর্ভুক্ত করি। ক্রমে শক্তির সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এবং ওর একটির পর একটি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে আমার মনে সন্দেহ থাকে না বিশ শতকের চতুর্থ পাদে বাংলা ভাষায় খাঁটি কবিদের মধ্যে বৈচিত্র্য, প্রাচুর্যে এবং মৌলিকতায় শক্তি সর্বাগ্রগণ্য। আশি এবং নব্বই-এর দশকে যাঁরা বাংলায় কবিতা লিখছেন তাঁদের ভিতরে সার্থক স্বকীয়তার বিচারে সম্ভবত জয় গোস্বামীই একমাত্র শক্তির কবিপ্রতিভার সঙ্গে তুলনীয়।

কিন্তু প্রায় বিশ বছর ভারতের বাইরে কাটানোর ফলে শক্তি যে গদ্য-লেখক হিসেবেও বিশিষ্ট এটা যথাসময়ে আমার নজরে পড়েনি। সম্প্রতি একজন তরুণ বন্ধুর সূত্রে শক্তির গদ্যসংগ্রহ তিন খণ্ড আমার হাতে এসেছে। অন্যান্য নানা কাজের চাপে তন্নতন্ন করে পড়বার মতো সময় করে উঠতে পারিনি। কিন্তু যতটা পড়েছি, অবাক হয়ে ভেবেছি বিরাট কবিখ্যাতির আড়ালে বিরল এক গদ্য-লেখক চাপা পড়েছিল, যে শেষ পর্যন্ত পদ্যের সাধনায় ডুবে গিয়ে তার গদ্যের সমৃদ্ধ সম্ভাবনাকে পরিণতি দিতে পারেনি। বিভিন্ন সময়ে লেখা, এমন এক খণ্ডে সন্নিবিষ্ট, নিরুপমের আখ্যান বাংলাভাষায় এক অবশ্যই উল্লেখ্য আত্মকাহিনী- নির্ভর উপন্যাস। কিন্তু তাঁর কুয়োতলা অংশে কী ভাষা কী আখ্যানে যে অপ্রতিম দক্ষতা এবং অভিনবত্বের স্বাদ পাই, পরবর্তী অংশগুলিতে তা ক্রমেই ফিকে হয়ে এসেছে। গোয়েটে ষাট বছর পেরিয়ে লেখেন চার খণ্ডে তাঁর দুঃসাহসিক আত্মজীবনী Dichtungund WahDriheit, তাঁর নিগূঢ় মনস্তাত্বিক উপন্যাস Wahlerwandtschaften, তাঁর দার্শনিক উপাখ্যানের দ্বিতীয় Wilhelm Meisters Wanderjahre, ৭৩ বছর বয়সে উলরিকের প্রেমে পড়ে তাঁর প্যাশানদীপ্র Marienlader Elegie এবং মৃত্যুর প্রায় অব্যবহিত পূর্বে তাঁর মহাকাব্য ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ড। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন খুব কম শিল্পীই দেখা গেছে গোয়েটের মতন যাঁর শেষ পর্যন্ত প্রতিভার দাম, নিপুণতা আর বহুমুখিতা বজায় চিল। কবিতা দেবী কোনো সময়েই শক্তিকে ত্যাগ করেননি, কিন্তু 'কুয়োতলা'র মহাপ্রতিভাবান তরুণ লেখক যে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের সুখপাঠ্য 'ট্যুরিস্ট গাইড' লিখে নিজের দুর্লভ শক্তির অপচয় করেছিলেন, তাতে বেদনা বোধ না করে উপায় দেখি না।

গদ্যসংগ্রহ প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় শক্তি তাঁর লিখনরীতির বড় চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন:

> বুকে বালিশ চেপে লেখা আমার অভ্যেস। নিজেকে উপুড় করে কলসী-কুঁজোর মতো। উপুড় করলে ওদের থেকে যেমন জল পড়ে মেজেয় পড়ে, তেমনই আমার কলম থেকে কাগজের ওপর নীল অক্ষর। ...এক ধরনের অন্ধকার আমায় নিজের মধ্যে ডুবতে সাহায্য করে সব সময়। আলোর মধ্যে আমার অস্বস্তি হয়।

উপুড়-করা কলসী -কুঁজো আর অন্ধকার নিজের মধ্যে ডুবে যাওয়া—এই দুয়ের মধ্যে নিজের যে শৈশব কাহিনী কুয়োতলাঃয় এঁকেছেন তারও চাবিকাঠি তুলে দিয়েছেন আমাদের হাতে ওই ভূমিকায় পরবর্তী একটি অনুচ্ছেদে:

> বিষয়টা ছিলো কিংবা কোনো প্রকৃত বিষয় ছিলো না— একটি ছোট্ট পাকা ঝিঁকুর ছেলে আর তার পরিপার্শ্ব। তাতে দুটি ডাগর চোখ, যা কখনোই সরল বিভূতিভূষণের মতন শুদ্ধ ও সামগ্রিক নয়— বেশ তেড়াবেঁকা, এক বগ্গা, নষ্ট আর পচধরা, যা ওর নিরুপম নামের সঙ্গে মেলে না, এরকম একটা কাটাছেঁড়া চোরা কাহিনী আর কথাভর্তি, ছবিভরা এক গদ্য।

এমন স্পষ্ট এবং যথাযথ শব্দচয়নে কুয়োতলা-র সার কথা আর কে দিতে পারত? তেড়াবেঁকা, পাকা ঝিঁকুর ছেলে, কিন্তু চোখ দুটি ডাগর আর ছবিভরা গদ্য। এমন দুটি বিপরীত মিল বাংলাভাষায় আর কেউ করতে পেরেছে বলে আমার জানা নেই।

শক্তি বিনয় করে লিখেছিলেন, ''গদ্যবাচক হিসেবে নিজেকে বামনের মতন মনে হয়।'' বিনয় সদ্‌গুণ, কিন্তু কুয়োতলা-র সঙ্গে তুলনা করতে গেলে যে দুটি উপন্যাসের কথা বিশেষ করে আমার মনে হয় তা একটি হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিবারাত্রির কাব্য, অন্যটি কমল মজুমদারের অন্তর্জলি যাত্রা। বিষয়, ভাষা, লেখকের দেখাবার চোখ— তিন জনেরই অনন্য, এবং তিন জনই শুধু পাঠককে লেখার গুণে চমৎকৃত করেন না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জাগ্রতচিত্ত হয়ে পড়তে বাধ্য করেন। আমি নিজে সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির লেখক, কিন্তু এই তিনটি বই-ই বাংলা সাহিত্যে ক্ল্যাসিক হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য এ সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। সুধী পাঠক পাঠিকাকে বলি কপালকুণ্ডলা আর চতুরঙ্গের পরে এই বই তিনটি পড়তে। নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার পরম্পরা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে।

সাধুভাষা আর কথ্যভাষার লড়াইয়ে বিজয়ী প্রমথ চৌধুরী কৃষ্ণনগরী ভাষাকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। তার পরে গদ্যসাহিত্যের সেই ভাষা নিয়ে অল্পবিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে। সুধীন্দ্র, অন্নদাশঙ্কর, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, কমল মজুমদার প্রত্যেকেই সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের সম্ভাব্য বিবর্তনে আপন আপন স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। আমি নিজেও

প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভাষা নিয়ে কিছু অনুশীলন করেছি। বাংলা নাটক, গল্প, উপন্যাসে বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং লৌকিক ভাষার কমবেশি সার্থক প্রয়োগ দেখতে পাই। শক্তি তাঁর বাল্যকাহিনীতে দোখনো পটভূমির দোখনো ভাষাকে অনেকটা জায়গা দিয়েছেন। সেখানে ডাব গাছ কামানো হয়, বড়ির ঝোলে মাসি হেসিং দেয়, আতাচোর বিরোৎ পাখিগুলি ভিড় করে, গইলে ডাঁশের ঠেলায় পা ঠোকে গরুবাছুরে, কুঁচকির দুটো দেশ আউরে ওঠে পেচ্ছাবের চাপে, বুড়ো পোঁদ সটকায়, গাছ সেখানে গাচ, দেখা সেখানে দেকা, পরিস্কার হয় পোস্কার, মুসলমান হয় মোচরমান। সেখানকার বড়ো বড়ো চোখ করে ডেমরেল মাছ সারা পুকুর চষে বেড়ায়। দেয়াল সেখানে দ্যাল, শেয়াল হয় শ্যাল, সময় সেখানে সোময়, লুকিয়ে রাখা হয় নুকিয়ে রাকা, কিছু হয় কিচু, কোথায় হয় কোতায়। চোখ সয়ে যায়, কান সয়ে যায়, আর আমরা ভেসে যাই সেই তেরছাভাবে দেখা ছোট্ট পাকা ঝিঁকুর ছেলেটার কাহিনীতে যে তার হৈদরদার কাছে শিখেছে 'মরামরা এক ধরনের রূপসী বিবিজান...তার দেইকে মরতি রানন্দই হয়।'

সেই বহমান স্রোতে ভেসে ওঠে, মিলিয়ে যায একটির পর একটি স্মরণীয় মুখ— সেই ভ্যাজভাজ করা বুড়ো দাদু যার বাড়িটা ভজামার্কা, শরীরে তৃপ্তিহীন তেষ্টাওয়ালী টাকুমাসি ইতর অন্ধকারে যার 'বুকটা মুখটা শোথ হওয়া উরুর মতন', ঝুঁকে রান্নার সময় যার 'ব্যাং বেরিয়ে পড়ে', নায়েববাবুর নাতনি মিষ্টি মেয়ে শামলি কুষ্টের দাগ ঢাকতে 'যে উরুৎ পর্যন্ত শাদা মোজা পড়ে থাকে সব সময়' আর 'বুকে ন্যাকড়া বাঁধে', বাঙাল স্টেশন মাস্টারের স্বামী পরিত্যক্ত মেয়ে সবিতাদি আট/ন বছরের ছেলে নিরুকে বুকের মধ্যে চেপে ধরার পর যার নাক মুখ দিয়ে আগুন ছোটে, যে নিরুপমাকে গল্প শোনায় আর যার জন্য নিরুপমের বড় মায়া, দুমড়ে যাওয়া শরীর হাদ্দা যার ছেলের বৌ তার মুকে দিনে দশবার নুড়ো জ্বেলে দেয় আর যে গাচগাচলি চেনার ব্যাপারে, মাচের বারুদ বানানোয় নিরুপমের শুরু আর ভালবাসার মানুষ, নাকছাবিপরা রুক্মিণী যে একটু 'খইরি', চোপা করে, সাহেবদের মতন দারুণ রং গম্মা মামা কাঁটাঅলা জুতো পরে যে ফুটবল খেলে আর মাথায় রক্ত উঠে যে একমত্তমে মরে গেল, তার ভাই আলতা আর মেন্দি মাকা কানুমামা যে নিরুকে গাল দেয় 'পেড়োয় পেদে এয়েছো' বলে, বেড়ালের কামড়ে গলায় নলি ছিঁড়ে মরে যাওয়া সহপাঠী অনুতোষ, আর সেই বড় ভালবাসার হৈদরদা গাছ জখম করলে যার 'বুকি লাগে' —মানুষের পরে মানুষ দৃশ্যের পর দৃশ্য, ঘটনার পর ঘটনা— আর তারা বলে সেই ঝিঁকুর ছেলেটার ক্রমে বেড়ে ওঠার কাহিনী। এই কাহিনীতে দেহের জেগে ওঠা আছে, আছে ভালবাসার বিচিত্র রূপ, আছে গরীব নিঃসঙ্গতা বোধ, নানা বয়সের নানা প্রকৃতির মানুষের পরস্পরবিরোধী বিচিত্র প্রবণতা, আছে অনুভূতিশীল বালকের অসহায় অভিমান আর কৌতূহল, আছে সন্ত্রস্ত মমতার ওপরে ডানামেলা মৃত্যুর ছায়া।

তারপর দাদু আর টাকুমাসির সেই অভ্যস্ত পরিবেশে হুড়মুড় করে এসে পড়ে সপরিবারে শহুরে বড় মাসি। মেজ মেয়ে রাঙামুখ ভিক্তি অচেনা নিরুকে হুকুম করে তার পা দুটো টিপে দিতে। আর তখন:

> ডান পায়ের পাতা তুলে, ওর রাঙা মুখ, ঝুঁকে পড়া নিরুপমের নাকের ডগা চিমটে দিয়ে ধরতে গেলে যেন দুপুরের উঠোনময় কালো তৃষ্ণার্ত কাকগুলো হাঁ মেলে এক লহমা বসেই উড়ে পালায়। ঐ লহমার ভারে নিরুপম মূলসুদ্ধ কেঁপে চমকে ওঠে, দুটি পদতল কর্তালের মতো ধরে দেহতত্ত্বের গান গেয়ে - ফেরা ভিখারির রূপে দণ্ডায়মান।

পদ্যকারের গদ্যে উপমার স্পর্শে বালক নিরুপম বয়ঃসন্ধির দিকে এগোয়। কিন্তু ভীষণ সে ভয়কাতুরে। বৃষ্টিপাত আর বিদুচ্চমকে ত্রস্ত সে জড়াতে চায় তার বড় মাসির সেজ মেয়ে তার চাইতে বয়সে সামান্য বড়ো মুকুটকে, আর তার মুখে ছিঃ শুনে ছিটকে পড়ে। তার পর ঘুমের মধ্যে তার শরীর বিশ্বাসঘাতকতা করে, ঘুম ভেঙে টের পায় বিছানায় সে মুতেছে, আর তার কাঁথা কেচে শুকোতে দিয়েছে ওই মুকুট। সেই গ্লানির সূত্রেই মুকুট আর সে পরস্পরের গভীর অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। আর তার পরেই পাটনা থেকে আসে আত্মঘাতী বাবার মৃত্যুসংবাদ—এবং তার চাইতেও সাংঘাতিক সংবাদ, নিরুপম তার মৃত বাবার সন্তান নয়। তার মা তাকে শ্রাদ্ধ করতে দেয় না। পাটনা থেকে ফিরে আসে নিরুপম আর এই ভয়ানক কথা জানায় তার সবচাইতে ভালবাসার জন মুকুটকে। লেখে:

> আমি নোংরা, মানহীন, পাপময় জায়গায় ফুটতে ফুটতে পরিণত হবো হয়তো। আমার ভাগ্যলিপিই তাই। আমি যে দিকে তাকাই সে দিকের পতন হয়। ...যারা আমাকে ভালবাসতে এসেছে তাদেরই অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।...মুকুট, এরও পরে আমাকে যত্ন দিয়ে ভালোবেসে, পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রীতির আচ্ছাদনে বাঁচাবে কে?...কী ভয়ানক কথা একদিন আমাকে বলবে বলেছিলে মুকুট, সে কি এই কথা? সে কি আমি যেমন, আমি তেমনই নই, এই কথা?

এরপর পুরোনো আশ্রয়ে দ্রুত ভাঙন ধরে। নায়েবের নাতনি শামলি—নিরুপমকে যে ভালবেসেছিল —চলে যায় তার বাপের কাছে আমতায়। দুই মামিতে এ দিকে একেবারে বনাবনি নেই। যে নষ্ট মাসি 'একরত্তি ছেলে থেকে তাকে এতটা বড়ো করেছে' স্থির হয় তাকেই কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 'বার্ধক্যপীড়িত বালকে'র আজই প্রথম 'সিংহাসনচ্যুতি মামির' পানে তাকিয়ে প্রাণ ব্যথিয়ে ওঠে। তারপর ভরদুপুর বেলায় খবর এলো নাতি এবং দুদু দুজনেরই প্রিয়জন হাদ্দার বড় অসুখ। নিরুকে সে দেখতে চেয়েছে। হাদ্দা মরবার আগে পাশে রাখা তার মাছধরার হুইলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিফল ইশারায় সেটা নিরুকে উপহার দিয়ে চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। তাকে শ্মশানে দাহ করে দাদু আর নাতি যখন বাড়ি ফিরল দুজনেই চোখই করমচার মতো লাল। পরদিন দাদুকে বাড়িতে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। হৈদরের কাছে খবর পেয়ে নিরুপম ছুটতে ছুটতে সাদা ধানের খেত মাড়িয়ে আল ধরে পৌঁছে দেখল:

> দাদু বুকের ওপর হাত দুটো জড়ো করে অঘ্রানের ধানের বিছানায় শুয়ে রয়েছেন... ঘরের মধ্যের মর্ত্যের বিছানা ছেড়ে আবদ্ধ পরিসীমাভুক্ত বাতাসের অভাব এতদিন বাদে তাঁকে বাইরে, মাঠের বুকে ধানের বিছানায় শুইয়ে অফুরন্ত বাতাসের বাধাহীন প্রবাহের মাঝে হত্যা করে।

দাদু গেলেন। এবার টাকুমাসির পালা, যাকে দাদু বলতো, 'কুরুচকুনে'। চতুর্থীর দিন মধ্যরাতের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে ইঙ্গিতে ডাকে

মাসি, 'যে মাসির দাবড়ানিতেই সে খোঁটাখোলা দামড়ার মতো বয়ে যায়নি।' নিরুর হাতে রুমাল বাঁধা একটা পুঁটলি দিয়ে বলে, 'তোকে কত গালমন্দ করেছি, ভুলে যাস রে,' সদরে চাবি দেওয়া, তাই কুয়োতলার দরজা দিয়েই মাসি বিদায় নেয়। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি, একা?' নিরুত্তর মাসি অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। আর নিরু? কুয়োর মধ্যে ঝুঁকে নিজের মুখ দেখার চেষ্টা করে। কিছু দেখা যায় না, শুধু শব্দ হয় (অনুমান করি সে ফেলে দেয় সেই রুমাল বাঁধা পুঁটলি)।

> যে শব্দটা দেখতে দেখতে বিসর্জনের বাজনায় রূপান্তরিত হয়। নিরুর অন্তঃকরণে এক অপরিসীম শূন্যতা জাগে, সে প্রিয়তম নতজানু হয়ে বসে। তার রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে ক্রমাগত রক্তপাতের শেষে তাকে আর চেনা যায় না।

কুয়োতলার ইঙ্গিতময় শেষ অনুচ্ছেদের থেকে আমরা শুধু অনুমান করতে পারি বাড়ির পাশের রেললাইনেই টাকুমাসির জীবনের পূর্ণচ্ছেদ টানা হয়েছিল।

শক্তির গদ্য সম্পর্কে লিখতে বসে কুয়োতলা থেকে আমি বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েছি। শক্তি লিখেছেন কুয়োতলা তাঁর 'প্রথম বড় গদ্য...অনেক ছোটবড় প্রকাশক-বাড়ি ঘুরে শেষ পর্যন্ত আমার বন্ধু চিত্ত সিং ছেপেছিলেন।' যতদূর জানি শক্তির জন্ম ১৯৩৪ সালে। কুয়োতলা লেখা হয় ১৯৫৬-৫৭ সালে, অর্থাৎ শক্তির বয়স তখন বাইশ/তেইশ; প্রথম বই ছাপা হয় ১৯৬১ সালে। বিস্ময় লাগে, এত অল্প বয়সে শক্তির গদ্যের হাত এতটা পাকা হয়েছিল— আরো তাজ্জব লাগে যখন স্মরণ করি এত অল্প বয়সেই এমন সূক্ষ্ম বোধ এবং কাহিনীগঠনে এমন পরিমিতি সে অর্জন করেছিল। অবশ্য এই কাহিনীর কতটা সত্যিই আত্মকথা আর কতটা কল্পনা তা নির্ণয় করা আমার অসাধ্য। গোয়েটে যে উপন্যাসটি লিখে বিশ্ববিখ্যাত হন সেই যুবক ভের্টর-এর দুঃখকথা (Die Leden des Jungen Werthers) যখন রচিত হয় তখন গোয়েটের বয়স পঁচিশ। সেটি অবশ্য বাল্যকালের কাহিনী নয়, আত্মঘাতী প্রেমিক তরুণের কাহিনী। তবে আমরা এখন জানি সেই কাহিনীতে বাস্তব ঘটনার অনুসরণ যতখানি তাতে কল্পনার মিশাল তার চাইতে কম নয়। বস্তুত গোয়েটে বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে তাঁর Dichtung und Wahrheit আত্মজীবনীতেও বিস্তর কারচুপি আছে। আর সেটাই তো স্বাভাবিক—শিল্পীরা তো ঐতিহাসিকদের কাজে মালমশলা জোগান দেবার জন্য আত্মজীবনী লেখেন না। তবে আমার কাছে যেটা কিছুটা দুঃখের লাগে সেটা হল শক্তি তাঁর প্রথম গদ্য রচনায় প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দেবার পর গদ্যে যা কিছু লিখেছেন তা প্রথম লেখার সঙ্গে তুলনায় অনেকটা নিষ্প্রভ, ম্লানায়মান। আমি ভ্রমণকাহিনীর কথা বলছি না, নিরুপমের আখ্যানের বাকি খণ্ডগুলির কথা ভাবছি। গদ্যরীতি, কাহিনী - বিন্যাসের নিপুণতা, মানবীয় অন্তর্দৃষ্টি, আত্মরতিমুক্ত আত্মজিজ্ঞাসা—সব দিকের বিচারেই কুয়োতলা বারেবারে পড়বার মতো বই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পদ্যই শক্তিকে পুরোপুরি গ্রাস করে। শক্তির সমকালে তার সমতুল্য কোনো বাঙালি কবিকে দেখতে পাই না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবিতা ছাড়াও লিখেছেন কালান্তর, যোগাযোগ, তাসের দেশ, 'সভ্যতার সংকট', এঁকেছেন অফুরন্ত অভিনব ছবির পর ছবি। গোয়েটে Romische Elegien আর Marienbader Elegie ছাড়াও লিখেছেন Wahlver wandtshaften, Dichtung und Wanderheit, দু খণ্ডে Wilhelm Meister, এবং তাঁর মহত্তম কীর্তি দু খণ্ডে Faust মহানাট্যকাব্য। শক্তিকে আমি প্রথম শ্রেণির কবি বলেই মনে করি; কিন্তু গদ্যকারের শক্তি দুর্লভ প্রতিভা অনুশীলনের অভাবে অপূর্ণ।

কুয়োতলা-র বেশিটাই ছোট চোট কাটা কাটা বাক্যবন্ধে লেখা। এ কাহিনীর এটিই সঙ্গত গত্যরীতি। মাসি যখন ভালবাসায় ভূতগ্রস্ত নিরুপমকে শামিল সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার খসখসে গলায় বলে, 'নেবার আগে একবার দেকে নিবি না ন্যাজে তুলে— জিনিষটা এঁড়ে না নৈ' তখন মাসির মুখে কথাটা চমৎকার মানায় (যদিও নৈ মানে যে মাদি বাছুর এ কথাটা আগে আমার জানা ছিল না)কিন্তু নিরুপম-শক্তি বালক হলেও কবি—যেমন তার মমতা, তেমনই তার কল্পনা, আর তাই উপমা তাকে নিয়ে যথাসময়ে যায় ছন্তি দীর্ঘ বাক্যবন্ধ্যের দিকে। মাসির অশ্লীল মুখফোড় আক্রমণে বিহ্বল নিরুপম ছাতের খোলা মেজের ওপর শুয়ে পড়লে তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন তার সেই ভ্যাজভ্যাজে ভালবাসার দাদু:

> অর্ধ সচেতন নিরুর দেহ কোলের ওপর নিয়ে বৃদ্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে— মনে হল যে জ্বালা জুড়োবে মেঘের পানে, মেঘের হৃদয়ের আসন্ন বৃষ্টি পানে এই তাকানো—সর্বঘাতের বিষ কোথায় বৃষ্টি বিনা মুক্ত হয়— এই ক্ষীণাতিক্ষীণ আশাবাহিত রোহিতাশ্ব-ক্রোড়ে শৈব্যার মতো, বুদ্ধের মূর্তি ইঞ্জিনের প্রচণ্ড আলোয় ভেঙে দিতে চাইলে মনে হলো সেই অগ্নিরেখার মুখ ও চাঁড়ালের জ্বলন্ত লগির আকৃতি-প্রকৃতি সমার্থ।

'গলায় খাঁকারি দিলে ভ্যাঁ করে উঠবি' —এই বাক্যবন্ধ থেকে উপরে উদ্ধৃত বাক্যবন্ধ্যে যার কলম সহজেই যাতায়াত করে সে তো শিল্পীর কবচকুণ্ডল সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল। এবং ছোট ছোট বাক্যবন্ধের সারিও যে একই সঙ্গে কাব্য ও দর্শনের স্বাদে পরিপুষ্ট হতে পারে তাও কিছু কিছু প্রমাণ আছে কুয়োতলায়:

> উঠোনের লজ্জাবতী লতার বিন্যাসের ওপর জলধারা ঝরে। জলধারা প্রাকৃতিক বলে ওরা মোটেই নুয়ে পড়ে না কুণ্ঠাময়ীর মতো। অথচ মানুষের স্পর্শ কি কৃত্রিম? মানুষের স্পর্শ কি কামিনী ফুলের ফুঞ্জ ভেঙে দেয়? কামিনীর তলে বিপুল নৈরাজ্য, অন্ধকারে নয়, আলোতে চোখে পড়ে।...কামিনীতলের মাটি নাকি বিষহরা। প্রকৃতির মধ্যে কেউ কেউ এখনো একমাত্র প্রকৃতিরই। কোনো কোনো গাছ এখনো গাছের, মানুষের নয়।

শক্তি একদিন চাইবে অরণ্যের চেয়েও আরো পুরনো অরণ্যের দিকে ভেসে যেতে। কুয়োতলা থেকে কি সেই যাত্রা শুরু? গদ্যে না হোক কবিতায় সেই একই সঙ্গে তুখোড় নাগরিক হয়েও অরণ্যের ডালপালা ছড়ানো স্বয়ংসিদ্ধ অন্ধকারের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিল।